দৈনিক বাংলা

তারিখ ..06 JUL 1987... ...
পৃষ্ঠা... ...5 কলাম... 3 ...

23

২১শে আষাঢ়, ১৩৯৪ বং

হযবরল পরীক্ষা

হোসনে আরা শাহেদ

এ জীবন পরীক্ষাগার। শুধু পরীক্ষা দিয়েই পৃথিবীতে কাল কাটাতে হয়, এ তথ্য আজকের দিনে সদ্য স্কুল-ফাইন্যাল-পাস হওয়া শিক্ষার্থীকেও উপলব্ধি করতে হয়। মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করতে হয়।

আজকের শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করে নিদারুণ জটিলতায়। তার পাঠ ও প্রস্তুতির সুযোগ পুরো পুরি তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর বর্তায়। বিদ্যা লয় থেকে আরম্ভ করে বিশেষ কোচিং অবধি সবই ভাগ্যের বিষয়।

তারপর সে পরীক্ষা দিতে যায় স্বধা-স্বন্দ্বের দোলায়। বুঝে গেছে সে, পরীক্ষার হলে প্রশ্নের জবাব ভালোভাবে লেখে আসাই শেষ কথা নয়। এরও পর অদৃষ্টের ওপর ভর করতে হয়। কেননা, দেশের অন্যান্য কেন্দ্রে কী হালে পরীক্ষা হচ্ছে, তার ওপর তার ফলাফল নির্ভর করে। ...পকর্মের অংশীদার না হলেও ...রই জন্য তাকে দেনা শুধতে ...। যদি নকলের মাত্রা বেশি ..., তবে পরীক্ষার খাতায় মাশুলে ...ত হবে তাকেও। ফ্রি-স্টাইল ...ীক্ষা যদি চলেই অধিকাংশ ...গায়, তবে সে ভার ...কও বইতে হয়। কেন নকল ...নো যায় না, কেন নকল আট ...া হলো না। এ জিজ্ঞাসা ...াও নেই। শুধু পরীক্ষকদের ... হয় 'কড়া হও। কাঠিন্য ...ও। বছরটিকে নকলকবলিত ... ঘোষণা দাও।' এমনি করে ... পিন্ডি বুধোদের ঘাড়ে ...ত হয়।

...জুড়ে কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ...াবিধি আরোপে এমন ...কেন, কে তুলবে এ প্রশ্ন? ...কোথাও কোথাও 'প্রবেশ... কাধিকবার চেক হয়, কেন ... কোথাও আদপেই চেক ...! প্রশাসনের এ ব্যবধান ... কে জবাব দিতে আসবে? ... বন্ধ ফটক, কেন্দ্রের ...া গজে আনাগোনা মানা— ... হলের বাতায়নের পাশে ... 'সাহায্যকারীদের' পদ-... কোথাও হলের ইন-...টর রুদ্র, রুক্ষ, নির্দয়; ... ইনভিজিলেশনে নিদা-...থিল্য, দেখেও না-দেখা, ...া-চাইতে জলের মত প্রশ্নের জবাব বলে দেয়া, কেন এমন হয়? এই-ই সব নয়। কোথাও কোথাও পরীক্ষার্থী নিজের প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষার কেন্দ্র পায়। কোথাও কয়েক মাইল পাড়ি দিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। কোথাও পরীক্ষার হলে ত্রাস, শংকা, ভীতি,—কোথাও অতিমাত্রায় স্বস্তি, শান্তি, সম্প্রীতি। কোথাও মাথা হেলালেই হুমকি, এবং অন্যায়ে বহিষ্কার; কোথাও হলের মধ্যে হট্টগোলেও ক্ষতি নেই এবং বই দেখে লেখার দেদার অধিকার। এ পরিস্থিতিতে পরীক্ষার ফলাফলইবা কি অর্থ বহন করে?

আপন চেষ্টায় সৎ হয়েও তা হলে আর লাভ? কপাল গুণে অনুকূল পরিবেশে উদার কেন্দ্র না পেলে সবই তো চুরমার। এই সব পরীক্ষার 'ভাগ্য' নামের অদৃশ্য বস্তুটির দোর্দণ্ড প্রতাপ।

পরীক্ষার সময় লুজ শিট বা অতিরিক্ত স্ক্রীপট অধিকাংশ কেন্দ্রে আর সেলাই হয় না। দ্রুততার স্বার্থে স্ট্যাপলার দিয়ে লাগানো হয়। ঐ স্ট্যাপলারের বন্ধন কেন্দ্র থেকে বোর্ডে এবং বোর্ড থেকে পরীক্ষকের হাতে পৌঁছুতে যেসব স্তর আছে, তা সহ্য করে সব সময় অটুট থাকতে ব্যর্থ হয়। ফলে, আলগা হয়ে খোয়া যায়। খাতার ঐ হারিয়ে-যাওয়া অংশের সন্ধান কারো দায় নয়—যে-অংশ পাওয়া গেলো, তাতেই নম্বর দেয়া হয় এবং সে নম্বরই বিচার্য হয়। লুজশীট বা এক্সট্রা-স্ক্রীপট-বিভ্রাট আদপেই কেন্দ্র বা বোর্ডের শিরঃপীড়া নয়, যদি কোনও দয়ালু পরীক্ষক রিপোর্ট করেন, শোনা যায় তা নাকি বাহুল্যই বিবেচনা করা হয়। পরীক্ষায় মন ভরে খাতা ও পাতা নিয়ে লিখে এসেও কি করে জানবে পরীক্ষার্থী, তার উত্তরপত্র নিটোল আছে কি নেই? মাঝ-পথে কিছুটা বা পুরোটাই হারায়নি? অতএব ভাগ্যের ওপর তার সমর্পিত না হয়ে উপায়? বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরীক্ষকের মনন, জ্ঞান ও দর্শনে বিস্তর তারতম্য। মতের মিল উত্তরপত্রে প্রতিফলিত না হলে— নম্বর পাওয়া দুরূহ, হোক না সে উত্তর হাজারো যুক্তিগ্রাহ্য। এছাড়া চৌকস পরীক্ষার্থীর ভাব ও ভাষা বোধগম্য হওয়াও এক বিরাট প্রশ্ন। যুগ ও কালের পরিবর্তনে শিক্ষণীয় প্রতিটি বিষয়ই পড়ছে পরিবর্তনের আওতায়। তত্ত্ব, তথ্য, বানান, উপস্থাপনা— সর্বত্র আধুনিকতার ছোঁয়াচ। অনভ্যস্ত ও চর্চাবিহীন শিক্ষকের পক্ষে তা অনুধাবন দুরূহ। তাই অতি আধুনিক ধারা ও আধুনিকতম তথ্যে তাঁর মতো মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরীক্ষকের হাতে নম্বর পাওয়ার আশা ক্ষীণ। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকল্প কি, অদৃষ্টবাদী ভিন্ন হওয়া কি উপায়?

সব পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে দিলেও ফলাফল পাওয়া যায় না, 'স্থগিত' হয়ে থাকতে হয়। কোনো একটি বিষয়ের নম্বর টেবুলেটরের কাছে না পৌঁছুতে পারে। পারে কোনও বিষয়ের অর্ধেকাংশ, যেমন থিওরি অথবা প্র্যাকটিকালের কোনও একটির, নিরুদ্দিষ্ট হতে। বোর্ড, কেন্দ্র, পরীক্ষক দায়ি করতে থাকবেন এ ওকে, তারপর একটি নম্বর বসিয়ে দেবেন শূন্য স্থানে। এই অর্পিত নম্বর 'গড়' হলেও সান্ত্বনা ছিল, তা হয় না, এ হয় নিতান্তই মনগড়া। গড় নম্বরেও দুঃখ ঘোচে না, কারণ প্রতিবিষয়ে পরীক্ষা কোনও পরীক্ষার্থীর সমান হয় না—বেশি ভালোও হতে পারে। খাতা হারিয়ে গেলে ঐ ভালোটুকুও হারিয়ে যায় চিরতরে।

কেবল খাতা নয়, নম্বরের শিটও নিরুদ্দেশে যেতে পারে। যায়ও। হিসেব কে করে? কে কাকে ধরবে? স্তর তো মেলাই আছে। কাজেই সব ঠিকঠাক থাকার জন্য জোর বরাত লাগে। এই বরাতই আলাদীনের যাদুই চেরাগ হয়ে ভানুমতীর খেল দেখায়। এর কাছে এক একজন সহজ সরল অনভিজ্ঞ পরীক্ষার্থী সত্যি বড় নিরুপায়।

পরীক্ষার ফলাফল নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। কি করে নয় ছয় হয়, নয় ছয়? অপ্রিয় সত্য—এই এজন্য প্রবলভাবে দৃশ্যমান মানুষেরও কারসাজি কম নয়। রূপোর চাকতি আর প্রভাব প্রতিপত্তির কল্যাণে পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রেও দিন হয় রাত আর রাত দিন হয়। 'মানের' সঙ্গে ফলাফলের রফা কমই হয়। নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই বলে এবং প্রমাণের অভাবে করণীয় কিছু নেই বলে সব জেনে ও বুঝেও নিরীহ পরীক্ষার্থী নির্বিচারে মার খায়। ললাট-লিখনকে দায়ী করে স্তোক পায়।

পরীক্ষার এই ধাপ পেরিয়ে শিক্ষার্থীকে আরও কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় যেখানে ঐ অ-দেখা ভাগ্যই কাঠি নাড়ায়। যা পড়তে মনে-প্রাণে উদগ্রীব, তার ধার কাছে যাওয়াটাই অসাধ্য। যা পড়ার কথা মনে হয়নি কোন দিন, তাই পড়ার প্রস্তুতি নিতে হয়। জীবনভর বয়ে বেড়াতে হয় সেই অপছন্দের বিষয়। সেই অনুযায়ী নিজেকে বদলে ফেলতে হয়। বদলে যেতে হয়। নতুন মানুষ হয়ে যেতে হয়।

বাস্তবজ্ঞান আজকের তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে বাসা বেঁধেছে। দেশের মধ্যে লটারি নামের ভর্তি পরীক্ষাকে তারা এড়াতে চায় সামর্থ্য থাকলেই। সরাসরি বলে 'আমি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চাই।' যাদের আর্থিক বা অন্য-বল নেই, তাদের কাছে জানতে চাইলে বলে, 'আমার কিছু ঠিক নেই। গড়িয়ে চলা ক্ষীণ জলধারার মতোন যেখানেই ঠাঁই হবে, আমি তাই চাই।'

এরা ক্ষুদ্র অংশ। মাত্র ছোট্ট একটি অংশের কাছেই ভবিষ্যৎ প্রশ্ন করা হয়, বিশাল অংশ সম্পর্কে কোনও জানার নেই, জিজ্ঞাসারও নেই। তাই বলার উপায় নেই তারা কী চায়, কতোটুকু চায়।

প্রশ্ন করলে জানা যেতো, তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে চেষ্টা চালাবে অনবরত। ব্যর্থ হয়ে হয়ে ক্লান্ত হবে, একসময়ে মেনে নেবে, 'নাঃ হলো না, এটাই আমার ভাগ্য।' দম-ফুরিয়ে যাওয়া বানানো পুতুল যেন ওরা, ওরা নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়। এমন ভাগ্য-সেবী নির্জীব প্রাণেরা জাতির জন্য কী অবদান রাখবে, এটাই আজ বড় প্রশ্ন।